প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সৈয়দ জিয়াউল হক

প্রকৌশলী, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ; নির্বাহী পরিচালক, টেকভ্যালী নেটওয়ার্কস লিমিটেড; সাবেক সচিব, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল

সাত সকালে কোনো সময়ে টেলিফোন বাজলে অজানা আশংকায় বুকটা ধক করে ওঠে। এমনি একটি টেলিফোন পাই গত ২৮ এপ্রিল ভোরে। কোনো দুঃসংবাদ নয়তো! লাফ দিয়ে উঠে টেলিফোনটা ধরি। আমার আশংকাই সত্যি হলো। টেলিফোনের ওপাশ থেকে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ এনামুল কবির জানালেন সেই মহা-দুঃসংবাদ– প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী কিছুক্ষণ আগে ইন্তেকাল করেছেন। টেলিফোনটা রাখতেই আমেরিকার ডালাস থেকে আমার বোন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ থেকে পাস করা কৃতি ছাত্রী ফওজিয়া পারভীন এবং সিয়াটল থেকে আমার জামাতা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগ থেকে পাস করা মাইক্রোসফটের কৃতি ইঞ্জিনিয়ার মো: আহসানুর রশীদও একই সংবাদ জানালেন। মুহূর্তে আমার সমস্ত চেতনা লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা। যার সাথে বিগত ৩৫ বছরের নানান স্মৃতি, তার মৃত্যু সংবাদে আমার মাথার ওপরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মনে পড়ল চীনে কর্মরত আমেরিকান ডাক্তার নরম্যান বেথুনের মৃত্যুতে মাও সে তুংয়ের উক্তি, 'কোনো কোনো মৃত্যু হাসের পালকের চেয়েও হালকা, কোনো কোনো মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী।' জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের মৃত্যু তেমনি আমার কাছে হিমালয় পর্বতের চেয়েও ভারী।

আমি প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর সরাসরি ছাত্র ছিলাম না। তিনি ছিলেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের প্রফেসর। আমি ছিলাম তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের ছাত্র। তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হয় ১৯৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির যুগ্ম-সচিব হিসেবে। তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের প্রফেসর আবদুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সোসাইটি। ১৯৮৬ সালে আমি এই সোসাইটির যুগ্ম-সচিব নির্বাচিত হই। প্রফেসর পাটওয়ারী ছিলেন সভাপতি, প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী সহ-সভাপতি এবং সিএসই বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মাহফুজুর খান ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ড. মাহফুজুর রহমান খানের আকস্মিক মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রফেসর আনোয়ারুল য়াজীম এবং ইলেকট্রিক্যাল ও

ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর মুজিবুর রহমান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাদের সাথেও আমি যুগ্ম-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। কমপিউটার সোসাইটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপ-কমিটি ছিল প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা উপ-কমিটি। প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন এই উপ-কমিটির চেয়ারম্যান এবং আমি সদস্য-সচিব। প্রফেসর মতিন পাটওয়ারী এবং প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটিকে ব্রিটিশ কমপিউটার সোসাইটি এবং অস্ট্রেলিয়ান কমপিউটার সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। তাদের নির্দেশনা মতো আমি এই কাজে সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছি। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির কলেবর বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা মস্তিষ্কে নয়, উদরে।

বাংলাদেশে কমপিউটারায়নের শুরু ষাটের দশক থেকে। প্রফেসর আবদুল মতিন পাটওয়ারী ছিলেন এদেশে কমপিউটারায়নের স্থপতি। পরমাণু শক্তি কমিশন, আদমজী, জীবন বীমা কর্পোরেশন, ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস এবং বুয়েটে মেইন ফ্রেম কমপিউটার স্থাপনে তার ভূমিকাই ছিল মুখ্য। প্রফেসর জামিলুর রেজা ১৯৬৩ সালে বুয়েটে লেকচারার হিসেবে যোগদানের পর তিনিও প্রফেসর পাটওয়ারীর সাথে এসব প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার স্থাপনে সর্বতোভাবে নিয়োজিত ছিলেন। সে সময়ে আরও যারা এই কর্মযজ্ঞে অংশ নেন তাদের মধ্যে ছিলেন পরমাণু শক্তি কমিশনের ড. আনোয়ার হোসেন, হানিফ উদ্দিন মিয়া ও মো: মুসা, আদমজীর এএন ওয়ালিউল্লাহ, জীবন বীমা কর্পোরেশনের আনিসুর রহমান খান প্রমুখ। তারা সবাই বর্তমানে প্রয়াত। বাংলাদেশের মধ্যে বুয়েটে সর্বপ্রথম কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু করা প্রফেসর মতিন পাটওয়ারীর সুদূরপ্রসারী চিন্তারই ফসল।

১৯৭৮ সালে বুয়েট কমপিউটার সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রফেসর পাটওয়ারী এর প্রথম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি বুয়েটের উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ার পর

ঢাকায় ইউনির্ভাসিটি অব এশিয়া প্যাসেফিকে জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ ইলিয়নস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল সায়েন্স অধ্যাপক তাহের সাইফের হাতে সম্মাননা স্মারকক তুলে দেন

সেপ্টেম্বরে পরিচালক হন প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী। দশ বছরেরও অধিক কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আশির দশক থেকে নব্বইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকারি অফিসের সময়সূচি ছিল সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। কমপিউটার সোসাইটিতে নির্বাচিত হওয়ার সময় আমার কর্মস্থল ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড। অফিস ছুটির পর আমার নিয়মিত কাজ ছিল বুয়েট কমপিউটার সেন্টারে যাওয়া। কমপিউটার সোসাইটির অফিসও ছিল বুয়েট কমপিউটার সেন্টারে। সোসাইটির কাজ ছাড়াও আমার প্রায় প্রতিদিন সেখানে যাওয়ার মূল আকর্ষণ ছিল প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর সান্নিধ্য, যা আমার জীবনের পরম পাওয়া। ইংরেজিতে Versatile Genius বলতে একটা term আছে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী। একটানা বেশ কয়েক বছর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি তার সাথে কাটিয়েছি। তার নিজস্ব ক্ষেত্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য পরিমাপ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে কমপিউটার সায়েন্সসহ প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখা থেকে শুরু করে বঙ্কিম সাহিত্য এমনকি চর্যাপদ পর্যন্ত এমন কোনো বিষয় নেই যার ওপর তার দখল ছিল না।

১৯৯৪ সালে আমি বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের সচিব পদে যোগদানের পর থেকে সরকারি বিভিন্ন কমিটিতে তার সাথে কাজ করার আরও বেশি সুযোগ পেয়েছি। ততদিনে তিনি হয়ে উঠেছেন তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশের সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ এবং অভিভাবক। সরকারি উদ্যোগে দেশে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের বৃহৎ প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৯৬ সাল থেকে। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের উদ্যোগে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। টাস্ক ফোর্স 'Problems and Prospects of Software Export from Bangladesh' শীর্ষক রিপোর্টে Fiscal, Human Resource Development, Infrastructure এবং Marketing এই চার ক্যাটাগরিতে মোট ৪৫টি সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করে। এটি JRC কমিটির রিপোর্ট নামে পরিচিত। বস্তুত এটিই ছিল তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবে যাত্রা শুরু করার প্রথম দিক-নির্দেশনামূলক দলিল। এরপর তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের সব বড় অর্জন এবং ICT policy ও এ সম্পর্কিত যাবতীয় আইন-কানুন ও নীতিমালা প্রণয়নে তিনিই ছিলেন মূল ব্যক্তিত্ব।

প্রফেসর জামিলুর রেজার সাথে আমার সরকারি সফরে একাধিকবার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এর মধ্যে ২০০০ সালে আমেরিকায় 'সিলিকন বাংলা ইনফরমেশন টেকনোলজি (SBIT) কনফারেন্স'-এর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। আমাদের সেই দলে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী এমএ জলিল এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী জেনারেল (অব.) নূরুদ্দীন খানও ছিলেন। সিলিকন ভ্যালীর সাথে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে মূল কনফারেন্সসহ বিভিন্ন সভা এবং সংবাদ সম্মেলনে তার উপস্থাপনা ও বক্তব্যর পারদর্শিতা দেখে বিস্মিত হয়েছি। ২০০১ সালে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনের বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য বুয়েটের ব্যুরো অব রিসার্চ, টেস্টিং অ্যান্ড কনসালট্যান্সিকে (BRTC) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্ব প্রদান করার পর বুয়েটের বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি টিম কয়েকটি দেশের হাইটেক পার্ক পরিদর্শনে যায়। মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জেনারেল (অব.) নূরুদ্দীন খান এবং সচিব মুহ: ফজলুর রহমানের সিদ্ধান্তক্রমে একজন আমলার পরিবর্তে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীকে টিম লিডার করা হয়। আমিও সেই দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। বিভিন্ন সভায় প্রফেসর জামিলুর রেজার জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা দেখে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি কি কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার, কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি কি টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি কি ভূ-তত্ত্ববিদ, আবার কেউ জানতে চেয়েছেন

পুরস্কার ও সম্মাননা

- একুশে পদক (২০১৭)
- শেলটেক পুরস্কার (২০১০)
- বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন স্বর্ণপদক (১৯৯৮)
- ড. রশিদ স্বর্ণপদক (১৯৯৭)
- রোটারি সিড অ্যাওয়ার্ড (২০০০)
- লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল (ডিস্ট্রিক-৩১৫) স্বর্ণপদক
- ফিতা দণ্ড অর্ডার অফ দ্য রাইজিং সান (গোল্ড রে ও নেক রিবন) পদক - জাপান সরকারের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পদক (২০১৮)
- জাইকা স্বীকৃতি পুরস্কার

স্বীকৃতি

সম্প্রতি 'বাংলাদেশ ব্লক চেইন অলিম্পিয়াড পুরস্কার' এর নাম পরিবর্তন করে 'অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী চ্যাম্পিয়ন্স অ্যাওয়ার্ড' রাখা হয়। ৩ মে, ২০২০ এক অনলাইন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্লক চেইন অলিম্পিয়াড কমিটি ২০২০ সাল থেকেই এই পুরস্কার পরিবর্তিত নামে দেয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বাংলাদেশ ব্লক চেইন অলিম্পিয়াডের উপদেষ্টা ছিলেন। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ তার নামে এই পুরস্কারের পুনঃনামকরণ করা হল

তিনি অর্থনীতিবদ কি-না। যখন যে বিষয়ের ওপর কথা বলতেন মনে হতো তিনি সেই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ। ১৮ কোটি মানুষের দেশে এর দ্বিতীয় কোনো নজির আছে কি-না আমার জানা নেই।

জামিল স্যারের সৌজন্যবোধ ছিল অসাধারণ। যখন মোবাইল ফোন ছিল না প্রায়শই তার বাসায় (নম্বর ৫০৫২৫৮) এবং অফিসে (নম্বর ৫০৩৭৪৪) টেলিফোন করতে হতো। অনেক সময় তাকে পেতাম না। যিনি ধরতেন তাকে নিজের নাম বলে বলতাম পরে আবার করব। কিন্তু কখনো পরে আর ফোন করতে হয়নি। তিনি শুনেই কলব্যাক করতেন। আমাদের দেশে সাধারণত সিনিয়াররা জুনিয়রদের এবং পদস্থরা অধীনস্তদের ফোনের কলব্যাক করেন না। জামিল স্যার ছিলেন ব্যতিক্রম। কোনো সভা বা কাউকে কোনো অ্যাপয়নমেন্ট দিলে কখনো মিস করতেন না তা সে যতদিন পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকুক না কেন। তিনি বলতেন 'Only a busy man can give you time.' তিনি অন্যের প্রশংসা করতে কখনো কার্পণ্য করেননি। কোনো পত্রিকায় বা সাময়িকীতে আমার কোনো লেখা ছাপা হলে তিনি পড়ে মন্তব্য জানাতেন। আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে দৈনিক জনকণ্ঠে 'গেটিসবার্গ থেকে রেসকোর্স' এবং 'অসহযোগ আন্দোলন : মহাত্মা গান্ধী থেকে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আমার লেখা দুটি পড়ে আমাকে টেলিফোন করে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন তাতে আমি নিজেই বিব্রতবোধ করেছি। বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের সিরিয়াসধর্মী বই ও জার্নাল থেকে শুরু করে সমসাময়িক দৈনিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এমনকি বিনোদনমূলক বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও থাকত তার পড়াশোনার তালিকায়।

দেশে এবং প্রবাসে বাংলাদেশের কোনো ছাত্রছাত্রীর সাফল্যের কথা শুনলে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হতেন। বর্তমানে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর ড. জাহিদ হাসান কয়েক বছরের মধ্যেই নোবেল পুরস্কার পাবেন বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করতেন। ড. জাহিদের গবেষণার ক্ষেত্র কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান। সম্প্রতি তিনি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এটি একটি বিরল সম্মান। এই অ্যাকাডেমির সদস্যদের মধ্যে বর্তমানে জীবিত ৩৩ জন নোবেলজয়ী রয়েছেন। ড. জাহিদ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর সামসুদ্দীন আহমদ স্যারের জামাতা। জামিল স্যারের মৃত্যুর পর ড. সামসুদ্দীন স্যারকে ফোন করে আমি বিভিন্ন সময়ে আমার সাথে আলাপে ড. জাহিদের নোবেল প্রাপ্তির বিষয়ে তার আশাবাদের কথা উল্লেখ করলে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। ড. জাহিদ হাসানের পিতা অ্যাডভোকেট রহমত আলী ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালে চারবার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। ২০২০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেন।

২০১৮ সালের মাঝামাঝি একদিন জামিল স্যার আমাকে ফোন করে তার সাথে দেখা করতে বলেন। পরদিন এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সাথে অনেক আলোচনার পর তিনি আমাকে 'History of Computerization in East Pakistan and Bangladesh'- এই নামে একটি বই রচনা করতে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ডকুমেন্ট প্রদান করবেন বলে আশ্বাস দেন। এর কয়েক মাস পর আমরা বাসা বদল করে ধানমণ্ডি থেকে মিরপুর ডিওএইচএসে চলে আসি। তার পরপরই এনজিওগ্রাম করে আমার হার্টে স্টেনটিং করাতে হয়। সেই সাথে কিছুটা আলস্যও ছিল। তাই স্যারের নির্দেশমতো বইটি লেখার কাজ শুরু করতে পারিনি। এই মনোকষ্ট আমাকে সারা জীবন বহন করতে হবে। শেষের দিকে তিনি আমাকে বলতেন শরীরটা বেশি ভালো যাচ্ছে না– এইটুকুই। কিন্তু ড. পাটওয়ারী স্যারের কাছে শুনলাম মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন আগে ২৩ এপ্রিল তাকে ফোন করে জামিল স্যার বলেছিলেন যে তার ভালো লাগছে না, শুধু শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে– যে কথা আগে কখনো বলেননি। আসলে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তার শরীরটা ভেঙে পড়েছিল। সাধ্যের কয়েকগুণ বোঝা তার ওপর চাপানো হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের অসংখ্য কমিটির তিনি ছিলেন প্রধান। আমাদের দেশে যোগ্য মানুষের খুবই অভাব। তার ওপর যোগ্য লোককে কেউ সম্মান তো দেয়ই না, এমনকি যোগ্য লোককে সহ্যও করে না। তাই দেশের বিপুলসংখ্যক মেধাবী মানুষ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। তবে জামিল স্যার এক্ষেত্রে কিছুটা ভাগ্যবান। তিনি একুশে পদকসহ বিভিন্ন সম্মাননা লাভ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় তাকে যোগ্য সম্মান দিয়েছেন। জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করে তাকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন। এটিই ছিল দেশের প্রতি তার অবদানের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। বিশ্বখ্যাত বাংলাদেশের প্রকৌশলী ও স্থপতি এফ আর খান জামিল স্যারকে আমেরিকায় থেকে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি দেশে ফিরে এসেছেন, কখনো বিদেশে থাকার চিন্তা করেননি। দেশের কোনো বরেণ্য ব্যক্তির মৃত্যুকে আমরা সব সময় অপূরণীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু কারও স্থান শূন্য থাকে না, পূরণ হয়েই যায়। তবে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর স্থান যে পূরণ হওয়ার নয় এ কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি কজ

ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে এশিয়া প্যাসেফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জামিলুর রেজা চৌধুরী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ল'ইয়ার কামাল হোসেন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ফিডব্যাক : syedziabd@gmail.com